মধুর আমার মায়ের হাসি

মৈত্রেয়ী কুমার

Online version: http://wp.me/p7iuFD-3K

আমি ক্যাথারিন অ্যান্তোলিনি। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ওয়েসলিয়ান কলেজে ইতিহাস এবং জেণ্ডার স্টাডিজ পড়াই। থাকি নর্থ ফিলাডেলফিয়ার গ্রাফ্টন শহর থেকে মিনিট পঁয়তাল্লিশের ড্রাইভের দূরত্বে। গ্রাফ্টন! এই সেই শহর যেখানে ইণ্টারন্যাশনাল মাদারস্ ডে-র তীর্থভূমি। অ্যানা জারভিস আর তার পরম আদরণীয় মা অ্যান রিভস জারভিস-এর বাসভূমি। সন্তান ও মা-এর হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, নিষ্পাপ ভালোবাসা আর আকাশজোড়া স্বপ্ন দেখার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এই শহরের তৃণে-ধুলায়, আকাশে-বাতাসে।

এ বছর আমার মন বড়ই ভারাক্রান্ত। মারণ রোগে শয্যাশায়ী হয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছেন আমার মা। মাদারস্ ডে এখানে সরকারি ছুটির দিন। সকালে মাকে দেখে আসি, করার বা বলার কিছুই থাকে না। বেশীর ভাগ সময়েই তীব্র ওষুধের প্রকোপে মা ঘুমিয়ে থাকেন। ভাবলাম, আজ মাকে দেখে, যাই না একবার মাদারস্ ডে-র তীর্থপীঠ গ্রাফটনের সেই পুরনো চার্চে। যেখানে মাতৃ দিবসের স্বপ্ন দেখেছিলেন এক আটপৌরে মা। সংসার, সন্তান, কর্মক্ষেত্র সব দক্ষ হাতে সামলিয়ে এই জগৎ সংসারের কাছে আর কিছুই নয়, পেতে চেয়েছিলেন এক মুঠো সাদা কার্নেশান ফুলের মতন বুকভরা ভালোবাসার স্বীকৃতি।

দাঁড়িয়ে আছি সেই ঐতিহাসিক লাল ইঁটের ছোট পুরনো চার্চটার সামনে। চূড়াটা সাদা ধবধবে। পাকানো পাকানো হয়ে সরু হয়ে গেছে উপরে। আর পাঁচটা সাধারণ চার্চের মতন দেখতে হলেও এই চার্চ আদপেই সাধারণ নয়। কারণ এই চার্চের মাটিতেই বিশ্ব মাতৃ দিবসের স্বপ্নচারা জন্ম নিয়েছিল সেই ১৮৭৬ সালের ২৮শে মে। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি — ওই তো হাসিখুশি মুখের সাদা ফুলেল গাউন, মানানসই হ্যাটে মৃদু গম্ভীর স্বরে অ্যান রিভস জারভিস রবিবারের স্পেশ্যাল প্রেয়ার ক্লাস নিচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বসে আছে বারো বছরের অ্যানা। বাইবেল থেকে কিছু মায়েদের জীবন কথা পাঠ করে শোনাচ্ছেন রিভস। সেই সব মায়েরা যারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, সংসারের সকলের সুবিধা অসুবিধার খেয়াল রাখেন, বাড়ি ঘর তকতকে রাখা, ক্ষুধার্ত সন্তান স্বামী ও অতিথির খাদ্যের ব্যবস্থা করা, শরীর খারাপে সেবা, মন খারাপে সাহস বল ভরসা যোগানো — মা যেন সংসারের তপ্ত বালিতে এক ফোঁটা বৃষ্টি জলের মতন। সেই মায়াময় সোঁদা গন্ধের আমেজে এক জীবন পার করে দিতে পারে সন্তান। অথচ সেই তপ্ত বালুকা বেলায় মায়ের অবদানের কোনো স্মৃতিটুকু পড়ে থাকে না। কালস্রোতে ভেসে যায়। নজিরবিহীন, হিসেবহীন, মূল্যহীন হয়ে রয়ে যায় মায়ের স্বার্থত্যাগ, ভালোবাসা, মমতা আর কর্তব্যবোধ। জীবনের কাছে না পেতে পেতে মায়েদের মন সকল চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে উঠে কেবল প্রিয়জনের মঙ্গল কামনাতেই তৃপ্ত হতে শিখেছে। তবু আশা ছাড়েন না রিভস। ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়লে বাইবেল বন্ধ করে শান্ত সুরে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমি প্রার্থনা করবো, তোমাদের মধ্যে অন্ততঃ কেউ একজন কোনো একদিন কোনো এক সময়ে মায়েদের কথা ভেবে বুক ভরা ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। যে প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হবে নিজের নিজের মাকে ভালোবাসা জানানো আর বোঝানো যে মা সন্তানের জীবনে কি মহৎ ভূমিকাই না নিয়ে থাকে।’ ধীর পায়ে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন রিভস।

কলরব করতে করতে ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফেরার রাস্তা ধরল। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কেবল অ্যানা। বহু বছর পরে অ্যানা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘চার্চে ওই প্রার্থনা উৎসবে মা সেদিন যে কথাগুলো বলেছিলেন, শোনার পরে বুকের ভেতর কে যেন এক দীপ্তিময় শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। সে শিখার আগুন আজও নেভেনি।’

পায়ে পায়ে চলে এলাম চার্চের বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে। উজ্জ্বল দিন। নীল আকাশের সব আলো সবুজ ঘাসে এসে পড়েছে। বসলাম এসে উইলো গাছের ছায়ায়। মনে ভেসে এল সারা জীবন ধরে আমার মায়ের ছুটোছুটি করে কাজ করে যাওয়ার স্মৃতি। কখনো মাকে জিজ্ঞেস করা হল না — আচ্ছা মা, তুমি আজ কি খাবে বলো, আমি করে দেবো। অথবা, মা, তোমার প্রিয় রং কি? তোমার প্রিয় ফুল? তোমার চাওয়া? তোমার স্বপ্ন?

অশ্রু গড়িয়ে এল গালে। মাকে শুধু নেওয়ার যন্ত্র হিসেবে নিঃশেষে ব্যবহার করে এলাম। ফিরে তাকাবার বোধ এল যখন, মা নিতে চাইল না। হেলাভরে স্বার্থের পাওয়া উপেক্ষা করে নীরব অভিমানে রোগ শয্যায় শুয়ে রইল।

অ্যানা মাত্র বারো বছর বয়েসে মাকে স্বীকৃতি দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়েছিল। হায়, এই পরিণত বয়সে এসেও আমার মতন কত হতভাগ্য সন্তানরা আছে যাদের সে বোধটুকু উদয় হয় না!

মায়ের মতন মা ছিলেন বটে রিভস। নিজে একাধিবার সন্তান হারিয়েছেন। ব্যক্তিগত শোক ভুলে কোমর বেঁধে কাজে লেগেছিলেন অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর কারণে সন্তান ও মায়েদের মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতে। দরজায় দরজায় ঘুরেছেন, সুস্বাস্থের জন্য ক্যাম্পেনিং করেছেন। শুনেছেন মায়েদের অভাব অভিযোগ। সাধ্যমত চার্চ থেকে সাহায্য নিয়ে গেছেন। তখন সদ্য সিভিল ওয়ারের ধাক্কা সামলে উঠেছে আমেরিকা। পরিবারগুলো অভাব, অপুষ্টি, উদ্বেগে ধুঁকছে। দেহ-মন পরিশ্রান্ত। রিভসের পিস ক্লাব সাধ্যমত সবাইকে বুকে টেনে নিয়েছে। আক্রান্ত পরিবারগুলোর মায়েদের প্রতি রিভসের ভালোবাসা আর দরদের অন্ত ছিল না। অ্যানা শিশু বয়েস থেকে এই সবই দেখে বড় হয়েছে। মাকে নিয়ে তার মনে ছিল অফুরন্ত ভালোবাসা আর গর্ব।

সংসারে এক একটা ঘটনা যেন বজ্রপাতের মতন। কেন যে এমন হয় তা আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি ব্যাখ্যা দেবো? নইলে এমন হাসিখুশি, কর্মব্যস্ত, দরদী প্রাণবন্ত মানুষটার এমন আচমকা মৃত্যু হয়?

আহা, কালো পোষাকে শোকে কাতর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে ভাইবোন। অ্যানা, লিলিয়ান আর হাডকো। লিলিয়ান বেচারি আবার অন্ধ। ফাদার যখন রিভসের মরদেহ সমেত কফিনটা নামিয়ে দিলেন পৃথিবীর কোলে, ছুঁড়ে দিলেন একমুঠো মাটি শান্তির প্রার্থনায়, ‘ডাস্ট টু ডাস্ট, অ্যাশেস টু অ্যাশেস,’ কান্নায় ভেঙে পড়ল অ্যানা। মায়ের প্রিয় ফুল সাদা কার্নেশানখানি মায়ের কফিনে অর্পণ করে প্রতিজ্ঞা নিল মেয়ে, ‘মা গো, সেদিন আমাদের চার্চে তুমি প্রার্থনা করেছিলে যে কেউ কোনোদিন এই জগৎসংসারে মা’দের স্বীকৃতি দেবে। গড়ে তুলবে একটা ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান। আমি, তোমার মেয়ে অ্যানা, তোমার স্বপ্ন সফল করবো মা। তোমাকে তোমার না পাওয়া উপহার দেবো আমি। ঈশ্বরের নামে আজ তোমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে শপথ নিলাম, ইউ শ্যাল হ্যাভ ইওর মাদারস্ ডে।’

তারপর কত অন্তহীন পথ হাঁটলেন অ্যানা। মাকে জগৎসভার সিংহাসনে স্বীয় মর্যাদায় বসাতে কম কাঠখড় পোড়াতে হল না তাঁকে। সমাজের হর্তাকর্তাদের অবিরাম চিঠি লেখা, ক্যাম্পেনিং, ভাষণ। কাজের বিরাম নেই। সাড়াও পেলেন এক সময়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মানতে বাধ্য হলেন, মাদারস্ ডে আমাদের জীবনে পবিত্রময় ও সুন্দর ভাবনায় লালিত হয়ে পালিত হলে তা হবে দেশ ও মানুষের কাছে সম্মানীয় এবং আদরণীয়। কারণ ভগবানের পরেই জাগতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুমিষ্টতম সম্পর্কটুকু হল ‘মা’। ১০ই মে ১৯০৮। মাদারস্ ডে সরকারি স্বীকৃতি পেল।

পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম আমার অদূরেই গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক চার্চটার দিকে। হ্যাঁ, ঠিক এই চার্চের মাটিতেই দাঁড়িয়েই সেদিন অ্যানা শপথ নিয়েছিলেন মাতৃ দিবস উদযাপনের মহান ব্রতে। আর ফিলাডেলফিয়ার ওয়ানামেকার স্টোর অডিটোরিয়ামে সেদিন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল। কারা উপস্থিত ছিলেন না! প্রেসিডেন্ট, ফার্স্ট লেডি তো বটেই। ছিলেন মার্ক টোয়েন, দেশের প্রাক্তন পোস্টমাস্টার জেনারেল, বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসারবৃন্দ। আসন সংখ্যা ছিল সাকুল্যে পাঁচ হাজার, লোক জড়ো হল ১৫,০০০! পাক্কা সত্তর

মিনিটের বক্তৃতা ছিল অ্যানার। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, ‘মায়ের ভালোবাসা, সকল ভালোবাসার সেরা। স্বার্থের ছিঁটে থাকে না তাতে। এই ভালোবাসা এক আকাশ-পুকুর বৃষ্টিধারার মতন। আমাদের স্নিগ্ধ করে, উর্বর করে, প্রাণ দেয়। এই বিশেষ দিনে আমরা আমাদের মনের দরজা খুলে শুধু উদাত্ত সুরে আন্তরিক হয়ে একবার ‘মা’ বলে ডেকে তাঁকে জানাই যে, আমাদের জীবনে তুমি নক্ষত্রের মতন। মা, তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি। এর থেকে বেশী মা-রা আর কি চান? আমাদের সাদাসিধে গেরস্তালি মা। অল্পেই তৃপ্ত মা। সরল আনন্দময়ী মা। সর্বদা মমতার আঁচল বিছিয়েই আছেন। সেই আঁচলে ক্লান্ত জর্জর, সংসার দাবদাহে দীর্ণ সন্তান কখন এসে একটু জুড়োবে, শান্তি পাবে, এটাই মায়েদের একমাত্র চাওয়া।’

তুমুল জনপ্রিয়তা পেলেন অ্যানা। তাঁর বলা কথা মানুষের অন্তঃস্থলে ভালোবাসার পদ্মকোরক জাগিয়ে তুলল। পরের কয়েক বছরের মধ্যে গোটা যুক্তরাষ্ট্রের সব কটা রাজ্যে মাদারস্ ডে পরম সম্মানে ভূষিত হল। সরকারি ছুটির দিন বলে ঘোষণা করলেন সরকার এই পবিত্র দিনটিকে।

অ্যানা চেয়েছিলেন দিনটির প্রাণকেন্দ্রে থাকবে মা। মাকে দেখা, বোঝা, জানার দিন হবে মাতৃ দিবস। মায়ের সাথে সময় কাটানো, না-বলা কথা বলা, মায়ের মনে হারিয়ে যাওয়া সেই প্রিয় গান আবার মাকে শোনানো, মাকে দু দণ্ড শান্তির আশ্বাস দেওয়া — এই হবে মাতৃ দিবসের ব্রত। সাদা কার্নেশান ফুলকে অ্যানা মাদারস্ ডে-র প্রতীক ফুল ঘোষণা করলেন। আহা, সাদা কার্নেশান বড় ভালোবাসতেন তাঁর মা! দেশের যেখানে যত ছেলেমেয়েরা আছে তাদের উদ্দেশ্যে অ্যানা বললেন, ‘বাঁচো! ঠিক সেইভাবে, যেভাবে তোমাদের বেঁচে থাকতে দেখতে চেয়েছেন তোমার মা!’

জানি না, আজ আমি জীবনের যে পর্যায়ে পৌঁছেছি তা দেখে আমার মা খুশী হয়েছে কি না। গত দশ বছর সফল কেরিয়ার বানানোর ইঁদুর দৌড়ে আমি এত মগ্ন ছিলাম যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেত মাকে সামান্য ফোন করবারও সময় পেতাম না। ভার্জিনিয়ার বাসা বাড়িতে নিঃসঙ্গ মায়ের দিন কিভাবে কাটত তা আজ এই চার্চের বাগানে উইলো গাছের ছায়ায় বসে ভেবে কি লাভ হবে? তখন নিজেকে স্তোক দিতাম, নো নিউজ ইজ গুড নিউজ। তার মানে মা ভালোই আছে। ভাবিনি, মা হয়তো অভিমানে নীরব থাকত সন্তানের এই উপেক্ষায়। মায়ের জন্মদিনে দায়সারা গোছের উইশটুকু সেরে নিয়ম মাফিক ‘সব ভালো তো?’ প্রশ্নের মনোমতঃ জবাব ‘হ্যাঁ হ্যাঁ সব ভালো’ শুনে তৃপ্ত হয়ে আবার ডুবে যেতাম কাজে। আজ ভাবি, মা যদি বলত, ‘ক্যাথি, সব ভালো নেই রে মা! তোকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। নিজের হাতে রান্না করে তোর সামনে ধরতে ইচ্ছে করে। তুই পরম তৃপ্তিতে খুঁটে খুঁটে সবটুকু খাচ্ছিস দুচোখ ভরে দেখতে ইচ্ছে করে।’ তখন কি করতাম আমি! রিসার্চ, থিসিস পেপার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ, নিজের সংসার সব শিকেয় ফেলে ছুটে যেতাম কি মায়ের কাছে? হা ঈশ্বর! সত্য বলার সাহস দাও আমাকে।

ওঠার সময় হল। উইলো গাছের ছায়া পূর্বে লম্বা হয়েছে ঘাসে। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। ফেরার আগে ভাবছি দেখা করে যাবো চার্চের ভলেণ্টিয়ারদের সাথে। এরা লোক ভালো। কিন্তু এই যে অ্যানা জারভিসের এত চিঠি, দলিলপত্র ফাদারের মুখে শুনলাম বাক্সবন্দী হয়ে কিচেন ক্যাবিনেটে পড়ে আছে, সেগুলোর ভবিষ্যৎ কি? ফাদার অনুরোধ করে বললেন, ‘আপনি ইতিহাসকার। পারেন না এগুলোর একটা গতি করতে?’ মুহূর্তে মনে হল হাজার কাজের সাঁড়াশি চাপ থাক, এটা আমাকে করতে হবে। অ্যানার লেখা সব চিঠি, দলিলপত্রের যথার্থ আর্কাইভ দরকার। বিশ্বের মানুষের জানবার প্রয়োজন আছে যে মাতৃ দিবসের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি।

ফাদারকে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে চললাম। পরের সপ্তাহে অভূতপূর্ব ভাবে একটা বই হাতে এল। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী থেকে। লেখক ছিলেন ১৯৬০ সালে রিডার্স ডায়জেস্ট-এর সাংবাদিক। ততদিনে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে অ্যানা জারভিস শুধু বৃদ্ধাই নন, তিনি নিঃসঙ্গ ভঙ্গুর। নিজেকে বন্দী করে ফেলেছেন নর্থ ফিলাডেলফিয়ার বাসা বাড়িতে। সঙ্গী বলতে অন্ধ বোন লিলিয়ান। সেই লাল ইঁটের তিনতলা বাড়ির ভাঙা জালনাগুলো চব্বিশ ঘণ্টা ভারী ভারী পর্দায় ঢাকা থাকত। ভেতরে আলো আঁধারির ধোঁয়াশায় আবছা হয়ে থাকত ভিক্টোরিয়ান আমলের ঘরগুলো। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন নিজেকে অ্যানা। এতটাই তিক্ত লাগত

তাঁর মানুষের সঙ্গ যে দরজার বাইরে লিখে রেখেছিলেন — ওয়ার্ণিং : স্টে আওয়ে!

অতি নিকট পরিচিতরা জানত যে বিশেষ ভঙ্গীঁতে ডোরবেল বাজালে বা নক করলে তবেই ভেতরে যাবার দরজা খুলবে। এই সাংবাদিক অ্যানার ভাই হাডকোর সাথে পরিচয়ের সূত্রে দেখা করতে গিয়েছিলেন এক সময়ের সেলিব্রিটি, মাদারস্ ডে-র পথ প্রদর্শক অ্যানা জারভিসের সাক্ষাৎকার নিতে। সাংবাদিক সেদিন অ্যানার আঁধার ঘরের বিষন্নতায় একমাত্র জাজ্জ্বল্যমান দেখেছিলেন দেওয়ালে টাঙানো মিসেস রিভিসের বিশাল পোর্ট্রেটখানি। তীব্র গলায় অ্যানা সাক্ষাৎকারে যা বলেছিলেন তা সাংবাদিক জানিয়েছেন আমাদের — 'She told me, with terrible bitterness, that she was sorry she ever started Mother's Day।'

সেই সপ্তাহের উইকএণ্ডে আমি মাতৃহারা হলাম। মায়ের কবরের মাটিতে সাদা কার্নেশান ফুলের স্তবক রেখে সোজা চলে এলাম গ্রাফটন শহরের সেই চার্চে যা বর্তমানে মাদারস্ ডে ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশান নামে পরিচিত। ফাদারের অনুমতি নিয়ে সেই মুহূর্ত থেকে লেগে গেলাম কাজে। অ্যানার লেখা অজস্র চিঠি, পেপার ক্লিপিংস, দরখাস্ত, প্রতিবাদী স্লোগান, কি আছে আর কি নেই! জানি অ্যানার জীবন শেষের দিকে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতন হয়েছিল। কিন্তু আমার সে জানা বই পড়ে জানা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যানার স্বহস্তে লেখা চিঠি-চিরকুটে তার মনের আশা, স্বপ্ন, আনন্দ, হতাশা, রাগ দুঃখ বিষন্নতা। প্রতি পল, প্রতি দিন এক সংগ্রামের কাহিনী, যা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করবো আমার বই 'মেমোরাইজিং মাদারহুড'-এ।

আজ আমার হাতে এসেছে অ্যানার হাতের লেখা সাত পাতার এক দীর্ঘ চিঠি। নিজের বন্ধুসম কাজিনকে লিখেছে অ্যানা। সাল ১৯৪৪। — "ডিয়ার, আমার জীবনের বেঁচে থাকার মূল লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে কোথায় জানো? মাদারস্ ডে ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশানে। আমার প্রত্যেকটা শ্বাস ওঠা নামা করে এই প্রতিষ্ঠানকে কলুষিতমুক্ত রাখার প্রচেষ্টায়। বাইরে হায়েনার মতন ওৎ পেতে আছে কিছু সুবিধেবাদী দল। সুযোগ পেলেই ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ করবে ওরা এই পবিত্র দিনটার মাধুর্য্যকে।"

"ডিয়ার, তুমি রাগ করছ আমি এক কথায় আমার লাইফ ইন্সিওরান্স কম্পানীর চাকরিটা ছেড়ে দিলাম বলে। কিন্তু আর কি করতে পারতাম বলো? যদিও লিলিয়ানের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে, কিন্তু দিনের বেশীর ভাগ সময় আমার কেটে যায় এই সুবিধেবাদী ব্যবসায়ী সংস্থাগুলোর নানা ছল চাতুরীর সন্ধান করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে নিতে। সব থেকে অতিষ্ঠ করে তুলছে কারা, জানো? ফুল ব্যবসায়ীর দল। ভাবতে পারো, ১৯০৮ সালে ৫০০টা সাদা কার্নেশান কিনেছি আধা পেনিতে। আর আজ! এক একটা কার্নেশান বিক্রি হচ্ছে ১৫ সেণ্ট-এ! ভাবছি মাদারস্ ডে এমব্লেম থেকে সাদা কার্নেশান মুছে দেবো। এরা অন্যায় ভাবে লাভ তুলছে এই পবিত্র দিনটার থেকে।"

"হাডকো তোমাকে বলেছে আমি নাকি অত্যন্ত পজেসিভনেস দেখাচ্ছি মাদারস্ ডে অ্যাসোসিয়েশান নিয়ে। ঠিকই বলেছে। আমি বেঁচে থাকতে মাদারস্ ডে-কে সামনে দাবার ঘুঁটি করে এক শ্রেণীর পয়সালোভী দালালদের ব্যবসা করতে দেবো না। আর তাই কোর্টে এখনো পর্য্যন্ত তেত্রিশটা কেস করেছি। জানি না কবে সুবিচার পাবো, বা আদৌ পাবো কি না।"

"আজ দেশের সব ফুল ব্যবসায়ী, কার্ডের ব্যবসায়ী, মিষ্টি বিক্রেতা সবার চক্ষুশূল আমি। এরা ধান্ধাবাজ। মাদারস্ ডে-কে শিখণ্ডী করে স্পেশাল গিফট্ আইটেম বাজারে ছাড়ছে। লোকেদের প্রলুব্ধ করছে, পয়সা কামাচ্ছে। আমি প্রতিবাদ করে দ্য ন্যু ইয়র্ক টাইম্সে লিখলাম, 'As the foundr of Mother's Day, I demand that it ceases. Mother's Day was not intended to be a source of commercial profit.' কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কেউ আমার কথা কানে তুললে তবে তো! আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলো তো, তুমি তোমার মাকে যা বলতে চাও, সেই মনের কথা, প্রাণের ভাষা কি কখনো কোনো ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কার্ডে লেখা থাকতে পারে? মাতৃ দিবস উদযাপনের ব্রতে আমি রেখেছিলাম মাকে পর্য্যবেক্ষণ করা। মায়ের সাথে সময় কাটানো। যার জন্য এক কথায় চাকরি ছাড়লাম। এক মুহূর্তেও ভাবিনি, ওহ্! আমি এই কম্পানীর প্রথম এক শিক্ষিতা মহিলা যার দায়িত্ব অ্যাডভারটাইজিং এডিটর হিসেবে। আমি অর্থ, নাম, যশ সবের মায়া ছাড়লাম শুধু মাতৃ দিবসের পবিত্রতা বজায় রাখবো বলে। বদলে কি পেলাম শুনবে?"

“ওয়ানামেকার টি রুমে মাদারস্ ডে সংক্রান্ত মিটিং ছিল গেল শনিবারে। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে দেখলাম সালাড পরিবেশন করছে, মাদারস্ ডে সালাড ডিজাইন ডেকোরেট করে। চক্ষু স্থির হয়ে গেল এদের দুঃসাহসিকতায়। তীব্র রাগে আমার সালাডের প্লেট মেঝেতে ফেললাম আছড়ে। সেই নিয়ে কম জল ঘোলা হল না।”

“মিসেস প্রেসিডেণ্ট যে দ্য গোল্ডেন রুল ফাউণ্ডেশানের চেয়ার পার্সন তা তো তুমি জানো। ওঁরা অভাবী দুঃস্থ মায়েদের সেবা ত্রাণ করে থাকেন, এ ভালো কথা। কিন্তু বেছে বেছে মাদারস্ ডে-র দিনটাকে ক্যাম্পেন করে দান খয়রাতীর বন্যা বইয়ে দেবেন, এ কেমন কথা! আমি প্রতিবাদ করলাম। এলেনর রুজভেল্ট মিডিয়াকে বললেন আমি নাকি ভুল বুঝেছি ওনাদের। দেশের ফার্স্ট লেডি এটুকু বুঝতে পারছেন না মাদারস্ ডে উদযাপন মানে দান খয়রাতী করে মায়েদের করুণা বর্ষণের দিন নয়। এটা মায়েদের সমাদরের দিন। ভালোবাসার দিন। আচ্ছা, আমার মায়ের স্বপ্ন কি এত জটিল ছিল যে কেউ প্রকৃত অর্থটাই বুঝতে পারছে না?”

আমার হাতের ধোঁওয়া ওঠা কফির মাগ কখন জুড়িয়ে গেছে আমি খেয়াল করিনি। অন্য হাতে টাইমস্ আর নিউজ উইক খবরের কাগজের কটা ক্লিপিং-এ এত মন দিয়েছিলাম যে কফি খাওয়া মাথায় উঠেছে। বেশ দেখতে পাচ্ছি দিনরাতের লড়াই সত্ত্বেও মাদারস্ ডে-কে কমার্শিয়ালাইজেশানের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি অ্যানা। মাদারস্ ডে কার্ড ব্যবসায়ী, ফুল ব্যবসায়ী আর কনফেকশনারীদের কাছে দিনেক দিন হয়ে উঠেছে ক্যাশ কাউ। ন্যাশনাল রিটেল ফেডারেশান একটা তথ্য দিচ্ছে, তাতে দেখছি গড়পড়তা আমেরিকানরা বিশ বিলিয়ান ডলার ব্যয় করছে মাদারস্ ডে-র গিফট্ কিনতে। ৪০% কিনছে গ্রিটিংস কার্ড, ৬০% কিনছে ফুল!

রমরমিয়ে চলতে লাগল মাদারস্ ডে সেলিব্রেশন। মাদারস্ ডে হোলি ডে থেকে পরিণত হল হলিডে-তে। অ্যানা মা-কে জীবনের সাঁঝবাতির তারার আলো করে, মায়ের সামনে স্নিগ্ধ মোমের আলো জ্বেলে, সাদা শুভ্র কার্নেশিয়ানের কোমল মমতায় ভালোবাসাভরা কিছু কথা, গান, কবিতার মালায় সাজিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এই পুণ্য দিনের কলেবর। বদলে ব্যবসায়িক লাভ ক্ষতির কলরবে কদর্য্যময় হয়ে উঠল এই দিন।

আর অ্যানা? তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে পাগলামি বলে আখ্যা দিয়ে স্তব্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে তাঁর মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন। তিনি ফ্রাজাইল, গোমড়ামুখো, ছিট্গ্রস্ত। একটি উজ্জ্বল দীপ্তিময়ী, প্রতিবাদী, শক্ত মনের মানুষ উন্মাদ আখ্যা পেল সে যুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে। কোনো কোনো মহিলাও অ্যানাকে সহানুভূতির বদলে সমালোচনার কষাঘাত করতেই পছন্দ করলেন।

নিজেকে সরিয়ে নিলেন অ্যানা। গুটিয়ে গেলেন ব্যর্থতার হতাশার জালে। স্বীকার করে নিলেন পরাজয়। মানুষ চাকচিক্যে বিশ্বাসী। নামী দামী উপহারে মুগ্ধ, দেওয়া নেওয়ার অন্তহীন লোভে বদ্ধ। সেখানে তাঁর মায়ের নির্মল প্রার্থনার স্থান কোথায়!

প্যাণ্টের ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়ি। জোলো কফি কাপ সিঙ্কে নামিয়ে চার্চের পেছনবাগের বাগানে নেমে আসি। ইতি উতি ছড়ানো মৃত মানুষের কবর। বার্চ, ফার, উইলো গাছের ছায়ায় শান্তির ঘুম ঘুমোক এরা, এটাই প্রার্থনা। মিসেস রিভিসের কাছে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর বুকভরা কান্নার গমক সামলাই নিজের হতভাগ্য মায়ের কথা ভেবে। আচ্ছা, অ্যানা কি একটু দাম্ভিক ছিলেন? একটু নমনীয় হলে কি ক্ষতি হত? পরক্ষণে ভাবি, না, অ্যানা প্রকৃতই তাঁর মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে চেয়েছিলেন। রিভিস গালভরা দাম সর্বস্ব ফুলের তোড়া, চকোলেট বাক্স, হীরের সেট, এ সব কিছুই চাননি। শুধু চেয়েছিলেন সন্তানের কাছে ‘মা’ হিসেবে আন্তরিক স্বীকৃতিটুকু। ‘মা’-কে চেনা জানা বোঝা। এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। আমরাই বরং উল্টো পথের পথিক, তাই অ্যানাকে এত দুঃখ বরণ করতে হল মাকে ভালোবেসে।

মা মানে ধনী গরীব নির্বিশেষে জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্রের উর্ধ্বে এক অপূর্ব মানবীয় সত্তা। মাতৃ দিবসের পবিত্র আলোয় মা যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকুক সন্তানের চোখের আলোয়। অ্যানার স্বপ্ন আমরা সার্থক করতে পারিনি। লোভ, অলসতা আর

মননের অভাব আমাদের মনকে বিকশিত হতে দেয়নি। আমরা অর্থ দিয়ে সব ক্রয় করতে শিখেছি। ভালোবাসা, প্রেম, সততা, শ্রদ্ধা — সব। মা আর সন্তানের মাঝে মনের মেলবন্ধন আর হল না। কারণ সন্তান নিজের ভাষায় মায়ের সাথে কথা বলতে শিখল না। সে হলমার্কের কার্ডের ভাষায় কথা বলল। নিজের প্রাণের প্রদীপ মায়ের পায়ে দিতে শিখল না, তার আগেই পাড়ার ফ্লোরিস্টরা সুসজ্জিত ফুলের তোড়া ধরিয়ে দিল সন্তানের হাতে। মাকে মধুর বাক্য কি বলবে বুঝতে না পেরে হাজির করল ইয়াব্বড় কেকের বাক্স। মাদারস্ ডে লেখা। ফুল আঁকা। ঝকাঝক ডেকোরেট করা। আমরা যীশুকে মেরেছি ক্রুসিফিকেশানে আর অ্যানাকে মারলাম হলমার্কিফিকেশানে।

সাল ১৯৪৩। অসুস্থ নিঃসঙ্গ অ্যানাকে যখন বন্ধুরা পেনসিলভেনিয়ার ওয়েস্ট চেস্টার স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করিয়ে দিলেন, লিলিয়ান অন্ধ হয়েও স্পষ্ট দেখতে পেল, অ্যানা আর ফিরবেন না। ১৯৪৮ সালে অ্যানার মৃত্যু এল অবশ্যম্ভাবী রূপে। নিঃশব্দে, গভীরে। দেখলো সবাই বৃদ্ধা অ্যানা তাঁর রুমের দেওয়ালে মায়ের উদ্দেশ্যে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন — 'I am 6 years old and I love my mother very much. I am sending this to you because you started Mother's Day.' কি সরল ভালোবাসা ভরা উক্তি! সত্যি তো, যত বৃদ্ধই হোক আমাদের জৈবিক শরীর, মায়ের কাছে আমরা তো সেই শিশু সন্তান!

আর একখানি এক ডলার নোটের গায়ে অ্যানার লেখা শেষ কথা — 'I am sorry.' তিনি দুঃখ প্রকাশ করে গেলেন মায়ের স্বপ্ন পূর্ণ করতে না পেরে। শিব গড়তে বানর গড়ে ফেললেন, তার সব দায় নিজে বহন করে চলে গেলেন।

Memorializing Motherhood: Anna Jarvis and the Struggle for Control of Mother's Day
http://www.amazon.com/Memorializing-Motherhood-Struggle-VIRGINIA-APPALACHIA/dp/1938228936